ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1149-1157
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.333

ভাষা আন্দোলনের রক্তস্মৃতি থেকে বিশ্বায়নের যুগ

নিলুফা ইয়াসমিন, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyzes language as the fundamental basis of human identity and national consciousness. The Language Movement of 1952 demonstrates that the right to language is both a political and a human rights issue, which later laid the foundation for the spirit of the Liberation War. In the era of the global village or globalization, the dominance of English and the influence of technology are creating challenges for mother tongues, leading to the erosion of linguistic diversity and cultural memory. However, language preservation is possible through mother tongue–based education, development of digital content, and social awareness. Protecting the mother tongue means safeguarding identity and cultural plurality.

Keywords: Language, Mother Tongue, Identity, Protest, Globalization, Technology

কিছুদিন আগেই আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছি। ফেব্রুয়ারির সেই স্মৃতিময় দিনটি অতিক্রম করে এখন মার্চের অন্তরায় দাঁড়িয়েও ভাষা সম্পর্কে নতুন করে ভাবনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই দিনটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিক স্মরণ- এর উৎসব নয়, এটি ভাষার জন্য আত্মত্যাগ, সংগ্রাম এবং আত্মপরিচয়ের গভীর বোধকে পুনরুজ্জীবিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ। ভাষার জন্য মানুষের এই আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম তো বটেই সঙ্গে এটি মানুষের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি এবং আত্মপরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্তও বটে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে, যখন কম্পিউটার, স্মার্টফোন ও বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা ভাষা ব্যবহার করছি, তখন ভাষার অবস্থান ও তার পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা আরও জরুরি হয়ে উঠছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ই-মেইল, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, ব্লগ এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভাষার ব্যবহারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মানুষ এখন দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, যার ফলে ভাষার প্রচলিত রীতি ও শৈলীতে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্র যেমন বহুগুণে বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি ভাষার রূপ, গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। একদিকে ডিজিটাল মাধ্যম মাতৃভাষাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে একই সঙ্গে এটি একটি শক্তিশালী বৈশ্বিক ভাষার প্রভাবকেও বিস্তার করছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বাভাবিক শব্দচয়ন, ব্যাকরণ ও প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত বা প্রভাবিত

হচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভাষা ব্যবহারে যে মিশ্র ভাষার প্রবণতা দেখা যায়, তা ভবিষ্যতে ভাষার স্বকীয়তার উপর কী প্রভাব ফেলবে, সেটিও ভাবনার বিষয়।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে— প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের প্রভাব মাতৃভাষাকে কতখানি সমৃদ্ধ করছে এবং কতখানি তাকে সংকুচিত করে ফেলছে। একদিকে প্রযুক্তি ভাষার বিস্তার, সংরক্ষণ এবং সহজলভ্যতার পথ খুলে দিয়েছে; অন্যদিকে এর ফলে ভাষার সরলীকরণ, বিকৃতি কিংবা প্রভাবাধীন হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। ফলে এই পরিবর্তনকে একপাক্ষিকভাবে বিচার করা যায় না; বরং এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয় দিকই সমানভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এই কারণেই ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্মরণ করে বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে মাতৃভাষার অবস্থান, তার সম্ভাবনা এবং সংকট নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। ভাষার প্রতি এই সচেতনতা ও দায়বদ্ধতার বোধ থেকেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত। এই গবেষণায় ভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রযুক্তির প্রভাব এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে মাতৃভাষার অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে, যাতে ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে।

ভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের অবশ্যই একটি প্রধান ভিত্তি। তাই ভাষার মধ্যেই একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, অভিজ্ঞতা, বেদনা ও স্বপ্নের গভীরতম স্মৃতি সঞ্চিত থাকে। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না, এটি একটি সমাজের চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক অভ্যাস এবং মানসিকতার নির্মাণক্ষেত্রও বটে। ভাষার ভেতর দিয়ে একটি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই তারা নিজেদের অতীতকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। সেই কারণেই ভাষাকে একটি জাতির অস্তিত্বের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মনীষী আহমদ শরীফ তাঁর 'স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "...তাই তাঁরা স্বধর্ম ত্যাগ করলেও আঁকড়ে ধরে ছিলেন স্বভাষা। তাঁরা জানতেন, ভাষা ও সাহিত্য শুধু মহৎ প্রেরণায় সহায়কই নয়, জীবনানুভূতির ভিত্তি বা জীবনরসের উৎসও।"[১]

এই উক্তির মধ্যে ভাষার অস্তিত্বগত গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ভাষা মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে এবং সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই একটি সমাজ তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নির্মাণ করে। ফলে ভাষার ওপর আঘাত মানে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ওপর আঘাত। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বহু সময় ভাষার প্রশ্ন রাজনৈতিক সংঘাত, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। ভাষা কেবল মানুষের ভাবপ্রকাশের বাহন নয়; এটি তার চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এবং জীবনদৃষ্টিরও নির্মাতা। একটি জাতি তার ভাষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীকে উপলব্ধি করে, নিজের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন নির্মাণ করে। তাই ভাষা মানুষের মানসিক স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করে— এটি চিন্তার মুক্তি এবং আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম।

যখন কোনো শাসকগোষ্ঠী বা ক্ষমতাশালী শক্তি একটি জনগোষ্ঠীর ভাষাকে দমন করার চেষ্টা করে, তখন সেই প্রচেষ্টা কেবল ভাষাগত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর অন্তরালে কাজ করে সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গভীর আকাঙ্ক্ষা। ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ মানে মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, তার ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং তার সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করা। ফলে ভাষার ওপর আঘাত আসলে একটি জাতির

আত্মপরিচয়ের ওপরই আঘাত হানে। এই কারণেই ভাষার প্রশ্ন বহু সময় রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করে এবং তা মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়।

বিশ্ব ইতিহাসে ভাষা-নির্ভর আন্দোলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে মানুষ নিজের মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং এটি প্রতিরোধের শক্তি, প্রতিবাদের ভাষা এবং স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা মানুষের সম্মিলিত চেতনাকে সংগঠিত করে, তাকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়।

বাঙালির ইতিহাসে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এটি কেবল একটি স্মরণদিবস নয়; এটি আত্মত্যাগ, প্রতিবাদ এবং সাংস্কৃতিক আত্মমর্যাদার এক অনন্য প্রতীক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দেখিয়েছিল, ভাষার অধিকার কোনো সামান্য দাবি নয়— এটি মানুষের মৌলিক মানবিক অধিকারের অন্যতম ভিত্তি। মাতৃভাষার প্রতি এই গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা বাঙালিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ভাষা আন্দোলনের শহিদরা প্রমাণ করে গেছেন যে ভাষা মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ভাষা কেবল সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বাহক নয়, এটি রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা মানে নিজের পরিচয়, ইতিহাস ও সম্মান রক্ষা করা। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে কেবল অতীতের একটি ঘটনা নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রেরণা, যা আমাদের শেখায়— নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করা মানেই নিজের অস্তিত্বকে সম্মান জানানো।

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখছেন,

> "শুধু দূরদর্শনে নয়, একেবারে উপায়হীন না হলে জীবনের সর্বত্র আমরা বাংলার ব্যবহার করব, এই জেদটাই এখন প্রতিবাদের মূল ভর হওয়া উচিত।"[২]

এই বক্তব্যের মধ্যে ভাষার প্রতি এক গভীর সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। ভাষার ব্যবহার এখানে দৈনন্দিন প্রয়োজনের একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়নি; এটি একটি সচেতন সাংস্কৃতিক অবস্থান। ভাষার চর্চা মানুষের আত্মপরিচয় রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে— এই উপলব্ধিই এই বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মাতৃভাষার সংকট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এক নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এই ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম কেবল অতীতের কোনো অধ্যায় নয়; বরং এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত। আজকের দিনে প্রযুক্তি, গণমাধ্যম এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের ফলে একদিকে যেমন ভাষার বিনিময় সহজ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রভাবশালী ভাষার আধিপত্যও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অনেক ছোট ভাষা ও উপভাষা বিলুপ্তির মুখে পড়ছে, আর বৃহত্তর ভাষাগুলোর চাপে মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের শেখায় যে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, সংস্কৃতি এবং মানসিক স্বাধীনতার ভিত্তি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, যার দুটি অংশ ছিল— পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান। এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল, যা প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগকে দুর্বল করে তুলেছিল। কিন্তু ভৌগোলিক দূরত্বের চেয়েও বড় ছিল ভাষা, সংস্কৃতি এবং

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পার্থক্য। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষাভাষী এবং তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল বাংলাভিত্তিক; অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ছিল। এই বৈষম্য শুরু থেকেই এক গভীর অসামঞ্জস্যের জন্ম দেয়, যা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘাতের রূপ নেয়।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এই ঘোষণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষাগত অধিকারের প্রতি সরাসরি অস্বীকৃতি। বাস্তবে এটি কেবল একটি ভাষানীতি ছিল না; বরং এটি ছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এর মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রান্তিক করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল।

এই ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভাষার অধিকার রক্ষার দাবিতে ধীরে ধীরে আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে এক বৃহত্তর জাতীয় চেতনার ভিত্তি নির্মাণ করে। ভাষা আন্দোলন তাই কেবল ভাষাগত অধিকারের দাবি নয়; এটি ছিল আত্মপরিচয়, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে এই ইতিহাসের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কারণ আজও আমরা দেখতে পাই, শক্তিশালী ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে অনেক জাতি তাদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়— মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে কেবল একটি ভাষাকে সংরক্ষণ করা নয়, বরং একটি জাতির অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে রক্ষা করা।

এই প্রসঙ্গে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-

> "সেই কতকাল আগে, ১৯৫২ সালে, যখন সেকালের পূর্ব পাকিস্তানে কোথাও- কিছু- নেই হঠাৎ উর্দু রাজভাষার সর্বাত্মক দাপটের মুখোমুখি হয়ে বাংলাভাষার স্বাধিকাররক্ষার চ্যালেঞ্জ - যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ভাষা-আন্দোলন, তা-ই বিস্ফোরিত হল, তখন পশ্চিমবাংলায় আমরা আচমকা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেমন-যেন বিচলিত, হতচকিত হয়ে পড়লুম।"[৩]

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে ভাষা আন্দোলনের অভিঘাত পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বাঙালি সমাজে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ভাষা এখানে একটি সাংস্কৃতিক বন্ধন হিসেবে কাজ করেছে, যা ভৌগোলিক সীমারেখাকেও অতিক্রম করে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা দ্রুত সংগঠিত হতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সাল থেকেই ছাত্ররা ভাষার অধিকারের দাবিতে বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠিত রূপ দেখা যায় তামদ্দুন মজলিস এবং ছাত্রলীগের উদ্যোগে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে। এই সংগঠন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি ব্যাপক গণআন্দোলনের সূচনা করে।

আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও ছাত্ররা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর প্রমুখ। এই ঘটনাটি কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা

হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি হয়ে ওঠে একটি জাতির আত্মমর্যাদার সংগ্রামের প্রতীক। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সুফিয়া কামালের 'মিছিল'কবিতার সেই বিখ্যাত পংক্তি- "রমনা ঝিলের বুকে রক্ত- শতদল হেরে নেত্র মেলে /এত রক্ত কারা দিল ঢেলে।"[৪] এই রক্তস্নাত ইতিহাস বাঙালির সাংস্কৃতিক চেতনাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ভাষার প্রশ্ন একটি বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান হবে যদি আমরা প্রযুক্তির সকল শাখায় বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা কম্পিউটিং ও ডাটাবেস তৈরি এখন সময়ের দাবি।

এই আত্মদান ভাষা আন্দোলনকে গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করে এবং ভাষার প্রশ্নকে জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে উন্নীত করে। ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে এই জাতীয়তাবাদের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। এটি দীর্ঘ সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। অনেক গবেষকের মতে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক ভিত্তির সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসেরও সূচনা পর্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসে যখন ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে। এই স্বীকৃতি ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভাষাগত বৈচিত্র্য রক্ষার প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত রয়েছে। ভাষাবিদদের মতে প্রতি কয়েক সপ্তাহে একটি করে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেবল স্মৃতিচারণের দিন হিসেবে বিবেচিত হয় না, এটি ভাষাগত বহুত্ব রক্ষার একটি বৈশ্বিক আহ্বান।

আমরা দেখছি, বিশ্বায়নের ফলে অর্থনীতি, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তির প্রধান ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'ভাষা দুর্বল হলে জাতিসত্তা দুর্বল হয়' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "বিয়ে–টিয়ের ভোজে দেখবেন একটা মেনুকার্ড দেয়া হয়, তাতে ইংরেজি লেখা Radha Ballavi, Chnolar Daal ইত্যাদি। এমনি কি pappad! কলকাতার উচ্চারণ, এখনো কোলকাতা হয়ে গেছে। যেহেতু ইংরেজিতে হালে kolkata লেখা হয়। কলকাতার ক' এ এতটা ওকার পড়ত না।"[৫]

এই উদাহরণগুলো ভাষা ব্যবহারের অচেতন পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষার ব্যবহারে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

এ কারণে অনেক দেশেই মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি ভাষায় শিক্ষার প্রচলন বাড়ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ইংরেজি শিক্ষাকে উন্নত কর্মসংস্থানের চাবিকাঠি হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক সময় কমে যায়। অথচ শিক্ষাবিদদের মতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাতৃভাষায় শিক্ষা শিশুর বোধগম্যতা, সৃজনশীলতা এবং মানসিক বিকাশকে সমৃদ্ধ করে।

ভাষাবিদদের মতে শক্তিশালী ভাষার আধিপত্যে ছোট ও আদিবাসী ভাষাগুলো বিলুপ্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভাষারবিলোপের সঙ্গে হারিয়ে যায় একটি জনগোষ্ঠীর লোকজ জ্ঞান, মৌখিক ইতিহাস, আঞ্চলিক সাহিত্য, লোকসংগীত এবং প্রবাদ-প্রবচনের বিশাল ভাণ্ডার। প্রখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দৃশ্যপটে বাংলা: প্রয়োজনে চাই ভাষা- পুলিশ' প্রবন্ধে লিখছেন,

> "ভারতে যে কোন শহরে গেলে চতুর্দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, সেখানকার প্রধান ভাষা কী। একমাত্র কলকাতায়ই তার ব্যতিক্রম। কলকাতা দৃশ্যপট থেকে বাংলা ভাষা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।"[৬]

এই পর্যবেক্ষণ নগর সংস্কৃতির মধ্যে ভাষার সংকুচিত উপস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে।

বিশ্বায়নের ফলে গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন, কর্পোরেট সংস্কৃতি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষায় যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, তা আমাদের ভাষাজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নির্দেশ করে। বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণে গড়ে ওঠা নতুন কথ্য ভাষা— যাকে অনেকেই 'বাংলিশ' নামে অভিহিত করেন— বর্তমানে শহুরে ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনকে একদিকে ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন হিসেবে দেখা যায়, কারণ ভাষা কখনো স্থির নয়; সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষাও পরিবর্তিত হয়। কিন্তু অন্যদিকে, এই পরিবর্তন যখন মাতৃভাষার নিজস্ব স্বর, ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্র্য এবং সাংস্কৃতিক গভীরতাকে ক্ষুণ্ন করতে শুরু করে, তখন তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষত গণমাধ্যমের প্রভাব এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। টেলিভিশন, ওয়েব সিরিজ, ইউটিউব কনটেন্ট বা বিজ্ঞাপনের ভাষা আজ আর নিছক তথ্যপ্রদানের মাধ্যম নয়; বরং তা একটি নির্দিষ্ট জীবনধারা ও মানসিকতার নির্মাতা। বিজ্ঞাপনের ভাষায় ইংরেজি শব্দের আকর্ষণীয় ব্যবহার, কর্পোরেট দুনিয়ার 'প্রেজেন্টেশন কালচার', কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বার্তা আদান-প্রদানের প্রবণতা—সব মিলিয়ে ভাষার একটি নতুন রূপ গড়ে উঠছে, যা অনেক সময় প্রমিত বাংলার ব্যাকরণ ও শুদ্ধতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ফলে, একদিকে যেমন ভাষা সহজ ও গতিশীল হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই তার শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য ক্ষীণ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুর চিন্তার প্রাথমিক বিকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। শিশুর প্রথম আবেগ, প্রথম কল্পনা এবং প্রথম অনুভূতি মাতৃভাষার ভেতর দিয়েই প্রকাশিত হয়। এই কারণে মাতৃভাষা শুধু একটি ভাষাগত মাধ্যম নয়, বরং এটি ব্যক্তিত্বের ভিত্তি নির্মাণের প্রধান উপাদান। যখন একটি শিশু তার নিজস্ব ভাষার পরিবর্তে ক্রমাগত একটি মিশ্র বা বিদেশি ভাষার প্রভাবে বেড়ে ওঠে, তখন তার চিন্তার স্বাভাবিক বিকাশে একধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক পরিচয়ও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

এছাড়া, পরিবার ও শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যাওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অভিভাবকেরা শিশুদের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে বাংলার ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছেন। এর ফলে শিশুরা ধীরে ধীরে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, লোকঐতিহ্য এবং ভাষার সঙ্গে সংযোগ হারাতে থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল ভাষাগত নয়, এটি এক ধরনের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, যা ভবিষ্যতে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐক্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর যুগে স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ডিজিটাল বিনোদনের বিস্তার মানুষের ভাষা ব্যবহারের ধরণে এক বিপ্লব এনেছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি মাধ্যমে মানুষ

দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় ধ্বনিগতভাবে বিকৃত ভাষা ব্যবহার করছে। যেমন— বাংলা শব্দ ইংরেজি হরফে লেখা, বা ইংরেজি শব্দ বাংলার ব্যাকরণে ব্যবহার করা— এই প্রবণতাগুলি ভাষার একটি নতুন রূপ সৃষ্টি করছে। এই রূপটি যদিও সহজবোধ্য ও দ্রুত যোগাযোগের জন্য কার্যকর, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ভাষার শুদ্ধ রূপকে দুর্বল করে দিতে পারে।

সংগীত ও বিনোদন জগতেও এই পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট। কলারটিউন বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে বিদেশি শিল্পীদের গান ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এমনকি বাংলা গানেও ইংরেজি র্যাপ, হিন্দি শব্দ বা পাশ্চাত্য সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ধারা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক, অন্যদিকে তেমনই এটি বাংলা গানের নিজস্ব সুর ও ভাষার ঐতিহ্যকে আড়াল করে দেওয়ার ঝুঁকিও বহন করে।

বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা ও হিন্দি সংস্কৃতির প্রভাব তরুণ প্রজন্মের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন— সব ক্ষেত্রেই এই প্রভাবের ছাপ রয়েছে, এবং ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। তরুণদের মধ্যে 'কুল' বা আধুনিক দেখানোর প্রবণতায় অনেক সময় শুদ্ধ বাংলার পরিবর্তে মিশ্র ভাষার ব্যবহার বাড়ছে। এর ফলে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম না থেকে একটি সামাজিক মর্যাদা বা পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠছে, যেখানে ইংরেজি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে 'উন্নত' বা 'আধুনিক' হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়।

তবে এই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত নয়। ভাষার বিবর্তন একটি স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রক্রিয়া, এবং নতুন শব্দ, নতুন রীতি ভাষাকে সমৃদ্ধও করতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন হলো একটি ভারসাম্য রক্ষা করা—যেখানে আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পাশাপাশি মাতৃভাষার স্বাতন্ত্র্য, শুদ্ধতা ও সাংস্কৃতিক গভীরতাকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার যথাযথ চর্চা, পরিবারে মাতৃভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং গণমাধ্যমে শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ— এই বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত জরুরি। অতএব, বিশ্বায়নের এই যুগে ভাষার পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কিন্তু সচেতনতার মাধ্যমে আমরা এই পরিবর্তনকে একটি ইতিবাচক পথে পরিচালিত করতে পারি। মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বজায় রেখে, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই আধুনিকতার সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব। ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের সংস্কৃতি এবং আমাদের আত্মপরিচয়ের গভীরতম প্রতিফলন। তাই ভাষার এই পরিবর্তনের ধারায় আমাদের দায়িত্ব হলো— নিজস্ব শিকড়কে অক্ষুণ্ণ রেখে, নতুনের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করা। তবুও ইতিহাস আমাদের আশাবাদী হতে শেখায়। ভাষার জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করেছে এবং সেই আত্মত্যাগ একটি জাতির সাংস্কৃতিক শক্তিকে সুসংহত করেছে। তাই ভাষা কেবল যোগাযোগের উপকরণ হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি মানুষের মর্যাদা ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গেও যুক্ত। মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্থানীয় ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ, বিলুপ্তপ্রায় ভাষার শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণ এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার—এই সব উদ্যোগ ভাষা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রযুক্তিকে মাতৃভাষার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা গেলে ভাষার চর্চা আরও বিস্তৃত হবে।

২১ ফেব্রুয়ারির ইতিহাস আমাদের একটি গভীর শিক্ষা দেয়। ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি মানুষের স্মৃতি, সংস্কৃতি, অনুভূতি এবং অস্তিত্বের ধারক। ভাষার মধ্যেই একটি জাতির আত্মপরিচয় নির্মিত হয় এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার অতীতকে ধারণ করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। ভাষা আন্দোলনের শহিদেরা যে আত্মত্যাগ করেছিলেন তা কোনো একটি দিনের প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেই আত্মত্যাগ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষার জন্য মানুষের সংগ্রাম কখনও নিষ্ফল হয় না। ভাষার প্রশ্নে যে সচেতনতা সেই সময় গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তীকালে একটি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

বিশ্বায়নের যুগে ভাষার প্রশ্ন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রসারের ফলে একটি বিশ্বভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একাধিক ভাষা জানা মানুষের জ্ঞান ও সুযোগের পরিসরকে বিস্তৃত করে। তবে একই সঙ্গে মাতৃভাষার মর্যাদা ও চর্চা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মাতৃভাষা মানুষের চিন্তার প্রথম ভিত্তি। মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ তার সমাজ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। যদি মাতৃভাষার ব্যবহার কমে যায়, তাহলে সেই সমাজের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। এই কারণে ভাষা সংরক্ষণের প্রশ্নকে কেবল আবেগের বিষয় হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়; এটিকে একটি সাংস্কৃতিক নীতি এবং শিক্ষাগত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবারে শিশুদের মাতৃভাষায় কথা বলার অভ্যাস তৈরি করা, বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান হবে যদি আমরা প্রযুক্তির সকল শাখায় বাংলাকে সমৃদ্ধ করতে পারি। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বাংলা কম্পিউটিং ও ডাটাবেস তৈরি এখন সময়ের দাবি। ডিজিটাল যুগে ভাষা সংরক্ষণের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। অনলাইন শিক্ষা, ই-বুক, ডিজিটাল আর্কাইভ, ভাষাভিত্তিক সফটওয়্যার এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্যে মাতৃভাষাকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরও সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। যদি এই প্রযুক্তিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে মাতৃভাষার চর্চা আরও বিস্তৃত হতে পারে। প্রযুক্তিতে বাংলার অবস্থান ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) যুগে যদি বাংলার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত না হয়, তবে জ্ঞান- বিজ্ঞানের ভাষা হিসেবে বাংলা পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে। যদিও বর্তমানে ইউনিকোড আসার পর বাংলা টাইপিং সহজ হয়েছে তবুও গবেষণাপত্র ও উচ্চশিক্ষায় বাংলার ব্যবহার এখনো সীমিত। ভাষা একটি জীবন্ত সত্তা। মানুষের ব্যবহার, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে ভাষা ক্রমাগত বিকশিত হয়। তাই ভাষাকে সংরক্ষণ করার অর্থ এটিকে স্থবির করে রাখা নয়; বরং তার স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সুসংহত করা। ২১ ফেব্রুয়ারির স্মৃতি আমাদের এই দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে একটি জাতির আত্মপরিচয়কে সম্মান করা। মাতৃভাষা বেঁচে থাকলে সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, আর সংস্কৃতি বেঁচে থাকলে মানবসভ্যতার বহুত্বও অটুট থাকবে।

১৯৫২ সালের রক্ত স্মৃতি আজ কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি জীবন্ত দর্শন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া যে পথযাত্রা, তা আজ বিশ্বায়নের মহাসড়কে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের গর্বের এই উত্তরাধিকারকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন শুদ্ধ ভাষা চর্চা, প্রযুক্তিতে বাংলার সমৃদ্ধি এবং তরুণ প্রজন্মের মনে একুশের চেতনার সঠিক প্রতিফলন। এই কারণেই বিশ্বায়নের প্রবল স্রোতের মধ্যেও মাতৃভাষাকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে সমান মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। ভাষার চর্চা যত বিস্তৃত হবে, ততই একটি সমাজ তার সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করতে পারবে। ভাষা মানুষের আত্মার ঠিকানা। সেই ঠিকানাকে সযত্নে রক্ষা করা কেবল একটি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব নয়; এটি মানবিক কর্তব্যও। রক্তে কেনা এই বর্ণমালা যেন বিশ্বায়নের ঝরে বিলীন না হয়ে বরং বিশ্ব দরবারে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে- এটাই হোক আজকের শপথ। আগামী প্রজন্মের হাতে সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তুলে দেওয়াই আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

তথ্যসূত্র:

১. খাতুন, তাহমিনা, দে প্রবীর, সম্পাদনা। মায়ের ভাষা। শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ এন. ই. পাবলিশার্স। ২০১৬, পৃ. ২৫।

২. সেনগুপ্ত, দেবাশীষ, সম্পাদনা। একুশে ফেব্রুয়ারি। ২০০৬, পৃ. ৮৭।

৩. তদেব, পৃ. ৪৮।

৪. খাতুন, তাহমিনা, দে প্রবীর, সম্পাদনা। মায়ের ভাষা। শর্মিলা কুণ্ডু ও স্বপনকুমার ঘোষ এন. ই. পাবলিশার্স। ২০১৬, পৃ. ১৯৬।

৫. তদেব, পৃ. ৫২।

৬. তদেব, পৃ. ১৬৩।